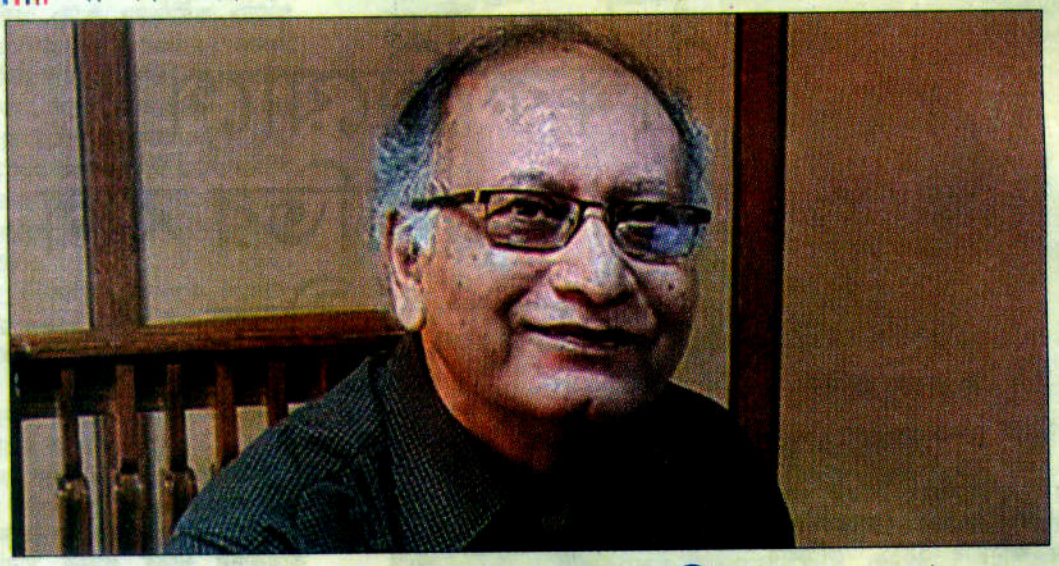

ড. মোস্তফা কে মুজেরী

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের ভূমিকা আরো জোরদার হবে

ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইএনএম) নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তফা কে মুজেরী। তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (বিআইডিএস) সাবেক মহাপরিচালক। দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতিতে নিরলস ভূমিকা রেখে চলেছেন ড. মোস্তফা কে মুজেরী। আর্থসামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলেছে *এই সময়*। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এম এ খালেক

টানা তৃতীয়বারের মতো রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে আওয়ামী লীগ। সরকারের এই ধারাবাহিকতা নিয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ কী?

আওয়ামী লীগ আরো ৫ বছর রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে। বিগত ১০ বছরে তারা দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপকভাবে অবদান রাখতে পেরেছে। ইতিপূর্বে বাংলাদেশে আর কোনো সরকার অব্যাহতভাবে এতটা সময় দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন তৃতীয় বিশ্বের জন্য 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আমরা অনেক আগেই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সূচকে পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে দিয়েছি। এমনকি কোনো কোনো সূচকে আমরা ভারতকেও অতিক্রম করে গেছি।

খাতভিত্তিক যদি বলতেন।

আমরা যদি খাতভিত্তিক পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব, বাংলাদেশ বিগত ১০ বছর ধরে সাড়ে ৬ শতাংশের বেশি হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। গত অর্থবছরে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭ দশমিক ৮৬ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, আগামীতে বিশ্বের ৯টি উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ ৭ শতাংশের বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বলে এতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জন সাধন করেছে। বাংলাদেশ বর্তমানে যে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ধারণ করছে তা সার্ক দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। বাংলাদেশের অর্থনীতি অত্যন্ত গতিশীল ধারায় এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘের রেটিং অনুযায়ী, বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের প্রাথমিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আগামী ২০২৪ সালে বাংলাদেশ চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে। এটা স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বড় অর্জন। আগামী দিনগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা আরো গতিশীল হবে– এটা আমরা আশা করতে পারি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই যে সাফল্য তার পেছনে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের অবদান কতটা বলে মনে করেন?

বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে গৃহীত অর্থনৈতিক নীতিগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়নকেই আমি বিশেষ গুরুত্ব দেব। সরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব নীতি গ্রহণ করেছে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরেছে বলেই উন্নয়নের ক্ষেত্রে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের ক্ষেত্রে সুযোগটা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু একে আমরা এখনো পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারিনি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এসইআইপি নামে যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে সেখানে দেশের শ্রমশক্তিকে প্রশিক্ষণদান এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে কাজে লাগানো যায় তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমরা যদি ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুযোগ কাজে লাগাতে চাই তাহলে উপযুক্ত এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। অর্থাৎ প্রতি বছর দেশের শ্রম বাজারে যে নতুন মুখ আসছে তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে। তা হলেই কেবল আমরা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুফল ভোগ করতে পারব। কাজেই আগামীতে দেশে কারিগরি শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটাতে হবে। একজন মানুষ শুধু সরকারি চাকরির জন্য ঘুরবে কেন? তাকে এমন শিক্ষা প্রদান করতে হবে যাতে সে নিজেই আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে নিতে পারে। আগামী দিনগুলোতে দেশে

কারিগরি শিক্ষা বিস্তার ছাড়া কোনো উপায় নেই।

জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রেও তো কারিগরি শিক্ষার চাহিদা বাড়ছে।

ঠিক তাই, শ্রমশক্তিকে প্রশিক্ষিত করার গুরুত্ব শুধু স্থানীয় বাজারের জন্যই প্রযোজ্য নয়। আমরা বিদেশে যে শ্রমশক্তি রপ্তানি করি তাদেরও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করা গেলে এ খাতের আয় অনেকগুণ বাড়ানো সম্ভব। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুফল কাজে লাগানোর জন্য জাতীয় পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন চলছে। কাজেই বছরগুলোতে আমরা এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারব বলে মনে করি। আশার কথা এই যে, সরকার জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য ব্যাপকভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতেহারে জনশক্তিকে প্রশিক্ষিত করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সরকার আগামী ৫ বছরে ১ কোটি ২৮ লাখ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে নির্বাচনি ইশতেহারে অঙ্গীকার করেছে।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে গ্রাম ও শহরের বৈষম্য দূর করার বিষয়ের জোর দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে কী বলবেন?

আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে প্রতিটি গ্রামকে শহরে পরিবর্তিত করার কথা বলা হয়েছে। এটা একটি প্রতীকী কথা। এর অর্থ এই নয় যে, গ্রামগুলোকে শহরে পরিণত করা হবে, গ্রাম বলে আর কিছু থাকবে না। এই পরিবর্তনের মূল কথা হচ্ছে, শহরে যে সব সুবিধা পাওয়া যায় তার সবই যাতে গ্রামে পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করা হবে। যেমন শহরে ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। সেখানে শহরের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে। রেজাল্ট ভালো করছে। গ্রামেও এ ধরনের উন্নতমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ইন্টারনেট যোগাযোগ ইত্যাদির উন্নতি ঘটিয়ে গ্রামীণ জীবনযাত্রাকে আধুনিকায়ন করা হবে। গ্রামেও শহরের মতো স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হবে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে শহরে যে সব আধুনিক সুবিধা পাওয়া যায়, গ্রামের মানুষও যাতে তা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। গ্রামকে বঞ্চিত করে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা শুধু শহরের মানুষই ভোগ করবে এটা যাতে না হয় তার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এর ফলে বিকেন্দ্রীকরণও তো গতি পাবে?

অবশ্যই। গ্রামে যদি শহরের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করা যায় তাহলে আমরা যে শহর বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলি তা খুব সহজেই করা সম্ভব হবে। শহরের যেসব সুবিধা পাওয়া যায় তা গ্রামে বসেই পাওয়া সম্ভব হলে মানুষ অকারণে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে আগ্রহী হবে না। রাজধানী ঢাকা শহরে আমরা জনসংখ্যার যে চাপ প্রত্যক্ষ করছি তার মূলে রয়েছে এখানে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা

‘আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে গ্রামের ওপর এই যে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা নানা কারণেই বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। আগামী দিনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি’

পাওয়া যায়। যে সুবিধাগুলো কোনোভাবেই গ্রামে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা যদি শহরের সুবিধা গ্রাম পর্যায়ে সম্প্রসারিত করতে পারি তাহলে শহরের যে সব নেতিবাচক দিক আছে তার অনেকটাই আপনাআপনিই সমাধান হয়ে যাবে। অর্থাৎ গ্রামগুলোর জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, একই সঙ্গে শহরের ওপর জনসংখ্যার অযাচিত চাপও দূর হবে। বর্তমান বিদ্যমান অবস্থায় শহর এবং গ্রামের মধ্যে অর্থনৈতিক-সামাজিক খাতে নানা ধরনের বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। এই বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা অনেকটাই কাজে দেবে। গ্রামের জীবনযাত্রার মান যদি উন্নত হয় তাহলে গ্রাম থেকে মানুষ শহরে এসে বস্তিতে বসবাস করতে চাইবে না। তারা গ্রামে থেকেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে।

এখনো দেশের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে থাকে। কিন্তু জাতীয় অর্থনীতিতে শহরের অবদান ৬০ শতাংশ। আর গ্রামের অবদান ৪০ শতাংশ। এ চিত্র কি বদলানো সম্ভব?

আমি তা মনে করি, গ্রামগুলোতে যদি শহরের মতো উন্নত সুবিধা সম্প্রসারিত করা যায় তা হলে গ্রামের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আসবে। এতে গ্রাম ও শহরের মাঝে বর্তমানে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে তা অনেকটাই দূর করা সম্ভব। আমরা যদি গ্রামীণ জীবন ব্যবস্থায় মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করতে পারি তাহলে গ্রামীণ জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। শহরের লোকজন যেভাবে মানসম্পন্ন লেখাপড়া শিখে শ্রমবাজারে যোগ দিচ্ছে গ্রামের মানুষও সেটা পারবে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে গ্রামের মানুষ আজকে যে পশ্চাৎপদ হয়ে আছে তা দূর হবে। তারা শহরের মানুষের মতো উৎপাদনশীল হয়ে উঠতে পারবে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে গ্রামের ওপর এই যে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা নানা কারণেই বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। আগামী দিনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি। আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং সবার জন্য স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনেও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে বর্তমান সরকার। এটা তো বড় এক চ্যালেঞ্জ।

আপনি যদি লক্ষ করেন তা হলে দেখবেন, ২০১০ সালে আমাদের দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৩১ শতাংশের ওপরে। সেই অবস্থা থেকে দারিদ্র্য কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে দারিদ্র্যের হার প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। দেশের অর্থনীতি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে আগামী ৫ বছরে দারিদ্র্যের হার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কমিয়ে আনা সম্ভব বলেই আমি মনে করি। দ্রুত দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনার যে অভিজ্ঞতা তা কাজে লাগিয়ে আমরা আগামীতে এ ক্ষেত্রে আরো সাফল্য অর্জন করতে পারি। দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে আমাদের খাতভিত্তিক বিচিত্র অভিজ্ঞতা রয়েছে। ম্যাক্রো ইকোনমি থেকে শুরু করে মাইক্রো ইকোনমি পর্যায় পর্যন্ত আমরা যে সব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছি তার সবকটির লক্ষই ছিল দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনা। এ ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যও উল্লেখ করার মতো। আমি মনে করি, আগামীতে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে আমাদের সফলতার পাল্লা আরো ভারী হবে যদি সঠিক পন্থায় আমরা এগিয়ে যেতে পারি।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে কী বলবেন?

বিগত দিনগুলোতে সরকার দুর্নীতি রোধ, সুশাসন নিশ্চিত করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা নিয়েছে। বিশেষ করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের কঠোর ভূমিকা ছিল। আগামীতে এই ভূমিকা আরো জোরদার হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ইশতেহারে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এই ম্যাসেজটা যদি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায় এবং সরকার আন্তরিকভাবে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে তৎপর হয় তাহলে দুর্নীতি মোটামুটি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব বলে মনে করি।

আপনাকে ধন্যবাদ।

আপনাকে এবং *এই সময়*-এর সবাইকে শুভেচ্ছা।